সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

‘বঙ্গদেশের কৃষক’ ও ‘রায়তের কথা’ : স্থানিক-কালিক পটভূমি এবং চিন্তাপদ্ধতি প্রশ্নে

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ এবং প্রমথ চৌধুরীর ‘রায়তের কথা’ প্রবন্ধ দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, দুটি প্রবন্ধই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের অবস্থা এবং উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় তাদের অবস্থান নিয়ে মূল্যবান পর্যবেক্ষণ হাজির করেছে। বাংলার ইতিহাস ও বর্তমানের সাথে ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে, এবং পাঠ-পদ্ধতিতে সাধারণভাবে বিমূর্ত আদর্শবাদিতা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে ‘রায়তের কথা’ প্রবন্ধের তুলনামূলক কম-সংখ্যক পাঠেও এর প্রায়োগিক মূল্য যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধ দুটি পঠিত হয়েছে মূলত স্থান ও কালের বিশেষ বাস্তবতার ফল হিসাবে, গুরুত্ব দেয়া হয়েছে চিন্তার প্রণালি-পদ্ধতির উপর। দেখানো হয়েছে, প্রবন্ধদ্বয়ে লেখকদের স্বতন্ত্র লেখকস্বর যথেষ্ট প্রতিফলিত হলেও যে পটভূমিতে এগুলো লিখিত হয়েছে তার স্বরই প্রধান থেকে গেছে। প্রায় পাঁচ দশকের ব্যবধানে একই বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো নিজ নিজ কালের স্পষ্ট চিহ্ন বহন করছে। দুটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে ওই কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাধারণ বাস্তবতা – ঔপনিবেশিক শাসন।

১.১

কৃষক বা রায়ত উনিশ শতকজুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে সাহিত্যিক-বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অঙ্গনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। উপনিবেশিত বাংলায় বিশিষ্ট উৎপাদন ও বণ্টনবিধির কারণে বিপুল কৃষকসমাজের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। এ দুর্দশা সাধারণভাবে বাংলার অন্য বুদ্ধিজীবীদের মতো সাহিত্যিক সমাজকেও স্পর্শ করেছিল। সাহিত্যিকরা নানা আঙ্গিকে এ বিষয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত রামমোহন রায় থেকে শুরু করে জমিদারি উচ্ছেদ পর্যন্ত বাঙালি লেখকেরা বিচিত্রভাবে রায়তের ভাবনা ভেবেছেন (অরুণকুমার ১৯৮২)। তার মধ্যে এখানে বেছে নেয়া হয়েছে প্রবন্ধ-আকারে প্রকাশিত দুটি

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.2

প্রতিক্রিয়া – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'।

এই দুটি প্রবন্ধ বেছে নেয়ার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। এক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও চিন্তক হিসাবে স্বীকৃত। কোনো একটি ঐতিহাসিক-সামাজিক বিষয়ে এঁদের মতামতের পর্যালোচনা সবসময়েই তাৎপর্যপূর্ণ। দুই. গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসাবে প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। দুটি প্রবন্ধই আকারে দীর্ঘ এবং প্রকারে গভীর। ফলে বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রণালি-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য এগুলো বিশেষভাবে উপযোগী। তিন. প্রায় আধা-শতক সময়ের ব্যবধানে রচিত প্রবন্ধ দুটিতে কালের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে একই বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ দুটিতে স্থান ও কালের প্রত্যক্ষতা পাঠ করা ওই স্থান-কালের বিশিষ্ট ভাবজগৎ উন্মোচনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। চার. প্রবন্ধ দুটির তুলনামূলক পাঠসূত্রে বঙ্কিম ও প্রমথের চিন্তাপদ্ধতি এবং তাঁদের কালের ভাবস্বভাবের কোনো কোনো দিক অধিকতর কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব।

১.২

'রায়তের কথা' নিয়ে তুলনামূলক কম হলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ নিয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। এসব আলোচনার অন্তত তিনটি ধরন চিহ্নিত করা সম্ভব।

ক) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬ : ১৪৬) লিখেছেন, 'মানবতাবাদই তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] চাষী-প্রীতির প্রেরণাস্থল।'[১] 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের উল্লেখ করে অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন (১৯৭৫ : ১২৪), 'এ প্রবন্ধে, 'সাম্য'-এ এবং বিশেষ করিয়া কমলাকান্তের 'বিড়াল'-এ তিনি যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার বিষয়গত বিপ্লবাত্মক সংকেতের কথা চিন্তা করিয়া আজ পর্যন্তও আমরা বিস্ময় বোধ করি।' বস্তুত 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'রায়তের কথা' সম্পর্কে এ ধরনের মূল্যায়নই বেশি দেখা যায়।[২] মানবদরদি বা মানবতাবাদী হিসাবে কৃষকপ্রীতিকে বর্ণনা করার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। উপনিবেশিত সমাজে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র মানবিক সহানুভূতির বোধই পুরো জনগোষ্ঠীকে একীভূত সমগ্র হিসাবে উপস্থাপন করতে পারত। সম্ভবত এ কারণেই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন, নারী-অধিকার আন্দোলন কিংবা কৃষক-বান্ধব অবস্থান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানবতাবাদী ডিসকোর্স খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'মানবতাবাদ' কথাটি ইতিহাসে এত বিচিত্র অর্থে ও ধরনে ব্যবহৃত হয়েছে যে, বিশেষ স্থান-কাল ও অবস্থার পরিচয় ব্যতীত শব্দটি কার্যত তেমন কিছুই নির্দেশ করে না। মিশেল ফুকো (১৯৮৪) প্রসঙ্গক্রমে এই বর্গটি বিশেষভাবে চিহ্নিত না করে ব্যবহার করার সংকট নির্দেশ করেছেন।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষকলিপ্ততার মূল্যায়ন বা পর্যালোচনা প্রায়শই এমন ভঙ্গিতে করা হয় যেন তা কোনো ধারাক্রমের অংশ নয়; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয় অনন্য হিসাবে। কিন্তু এদিক থেকে বরং কথাটা প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেই তুলনামূলক বেশি খাটে; কারণ, তাঁর প্রবন্ধে এমন কিছু প্রস্তাব আছে এবং এমন কিছু পর্যালোচনা আছে, যেগুলো সাহিত্যিকমহলে খুবই বিরল ছিল। বঙ্কিমের প্রবন্ধটি যে অন্যদের ধারাবাহিক চর্চার এক ধরনের পরিণতি – উৎকৃষ্ট কিন্তু সঙ্গীহীন নয় – সে কথা পরিষ্কার হয়েছে, উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, ভবতোষ দত্ত (২০০৮ : ২৫, ৪৫, ৫৭) কিংবা রবীন্দ্র গুপ্তের (১৯৮৯) আলোচনায়। কিন্তু 'যুগ প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা অনায়াসে কৃষক-বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারি' (রেজাউল ১৩৬১: ৬২)-র মতো দৃষ্টিভঙ্গিও খুবই সুলভ। বস্তুত, স্থান-কালগত পরিপ্রেক্ষিতজ্ঞানের অভাবেই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত হয়।

গ) বিশেষত 'বঙ্গদেশের কৃষক' পাঠের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে পাঠ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রবণতা অতি প্রবল। লেখকজীবনের শেষদিকে বঙ্কিম 'রক্ষণশীল' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'মুসলমান-বিদ্বেষে'র অভিযোগও খুবই পুরনো। এমতাবস্থায় বঙ্কিমের অনুরাগী পাঠকদের অনেকেই আলোচ্য রচনাটিকে এক ধরনের রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।[৩] রক্ষণশীলতার বিপরীতে উপস্থাপিত হয় কৃষকের প্রতি সহানুভূতির দলিল; অন্যদিকে মুসলমান-বিদ্বেষের অভিযোগের জবাবেও প্রবন্ধটি ব্যবহৃত হতে থাকে, কারণ, বাংলার কৃষকদের বড় অংশই মুসলমান গোত্রভুক্ত।

১.৩

বর্তমান আলোচনায় প্রবন্ধ দুটি পঠিত হয়েছে ইতিহাসের ধারাক্রমের মধ্যে, স্থান ও কালের বিশেষ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। একে বলতে পারি এক ধরনের ঐতিহাসিক বা নব্য-ঐতিহাসিক পাঠ। প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তার পাশাপাশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে চিন্তাচেতনা বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বক্তব্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছে তার উপর। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিভঙ্গি বা ডিসকোর্সের স্বরূপ অনুসন্ধান বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এদিক থেকে ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্লেষণপদ্ধতির কিছু বর্গ সামনে এসেছে; কারণ, যে কালপর্বে প্রবন্ধ দুটি লিখিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক বাস্তবতা। সব মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্থানিক-কালিক বাস্তবতা ও চিন্তাপদ্ধতি। ইতিহাসের পটভূমিতে ব্যক্তির তৎপরতা এবং সক্রিয় কর্তাসত্তার অনুসন্ধানও বিচার-বিশ্লেষণের অঙ্গীভূত হয়েছে।

২.১

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রকাশিত হয়েছিল *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় বাকি তিনটি

পরিচ্ছেদ যথাক্রমে 'জমীদার', 'প্রাকৃতিক নিয়ম' এবং 'আইন' শিরোনামে। ১৮৯২ সালে *বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ড* গ্রন্থে সংকলন করার কালে লেখক একটি ছোট ভূমিকা যোগ করেছেন, বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' আলাদা মন্তব্য করেছেন, কয়েকটি টীকায় নিজের তৎকালীন ভিন্নমত জানিয়েছেন, কিন্তু প্রবন্ধে বিশেষ পরিবর্তন করেননি।

প্রবন্ধের শুরুতে দেশের উন্নতির কথা বলা হয়েছে। লেখক এ উন্নতি স্বীকার করেন। শুধু মনে করেন যে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের উন্নতি হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেও দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের আয় অনেক বেড়েছে। প্রথমত, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়ত, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। কৃষিভূমি বাড়ার কারণ, ইংরেজ সুশাসনের ছায়ায় জীবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ফলে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। এভাবে, বঙ্কিম লিখেছেন, 'বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।' [বর্তমান রচনায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ না করে শুধু পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে।] তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে ১৮৭০/৭১ সালের একটি হিসাবও দাখিল করেছেন। কিন্তু এই বর্ধিত টাকা কৃষকের ঘরে যাচ্ছে না।

কোথায় যাচ্ছে? বণ্টনস্তরের সেই শনাক্তিতে বঙ্কিম নিগূঢ় পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, টাকা সরকারের কাছে যায়, মধ্যস্তরে বণিক ও ঋণদাতা মহাজনের হাতে যায়, আর সবচেয়ে বেশি যায় জমিদারের গোলায়। মার্কস যেমন শ্রমিকের শ্রমকেই যাবতীয় উৎপাদনের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, বঙ্কিমও অনেকটা সেরকমই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদনকেই যাবতীয় উৎপাদনের গোড়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আরো এগিয়ে তিনি এমন বলতেও দ্বিধা করেননি যে, এটা কৃষকের উৎপাদনই শুধু নয়, কৃষকেরই প্রাপ্য। কৃষকের পাওনা কৃষক যে পাচ্ছে না তার অর্থই হল, অন্যরা সেই পাওনা হরণ করছে। এ সিদ্ধান্ত রীতিমতো বৈপ্লবিক।

'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।' – এ ধরনের কবিত্বপূর্ণ বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'জমীদার' শুরু করেন। এখানেই শেষ নয়। এরপর তিনি জমিদার ও কৃষককে যথাক্রমে বাঘ ও ছাগ এবং রুইমাছ ও পুঁটিমাছ হিসাবে চিহ্নিত করেন, যেখানে প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে 'উদরস্থ করে'। কিন্তু এরপরই তিনি জমিদারপ্রশ্নে নিজের অবস্থান পরিচ্ছন্ন করেন : 'আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি।' কারণ, 'জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া'; কাজেই তাদের প্রীতিভাজন হওয়া কম গৌরবের কথা নয়। বঙ্কিমও প্রীতিভাজন হতে চান। সুখের বিষয়, 'অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল এবং সত্যনিষ্ঠ।' কিন্তু অনেকেই প্রজাপীড়ক। কাজেই তাদের অত্যাচার সম্পর্কে না বলে উপায় নাই।

একই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের অবস্থার যে বিবরণ পেশ করেছেন তা তাঁর গভীর লিপ্ততার পরিচয়। এই লিপ্ততা আসলে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার অন্যরকম প্রকাশ। সম্ভবত প্রশাসক হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষত গ্রামবাংলার সাথে নিবিড় পরিচয় এ কাজে তাঁর সহায়ক হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি বলতে পেরেছেন: '... এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।' কেউ যেন এ বিবরণকে কল্পিত বা বানোয়াট হিসাবে প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সেজন্য তিনি দু-ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। বলেছেন, যেসব অত্যাচার বা প্রদেয়-বিবরণী তিনি এখানে দাখিল করেছেন, সেগুলো একই ব্যক্তির উপর একাধারে প্রযুক্ত হয় এমন নয়, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার বৃহৎ বাংলায় হরহামেশাই ঘটে থাকে। অন্যত্র তিনি জমিদারের আদায়-তালিকার একটি লম্বা ফর্দ দাখিল করে বলেছেন: 'এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইন্ডিয়ান্ অব্‌জর্ব্বর্ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম।'

বস্তুত বিচিত্র আদায়-তালিকা, বিভিন্ন মাত্রার ও স্তরের নির্যাতন – শারীরিক-মানসিক-আর্থিক থেকে শুরু করে আইনি পর্যন্ত – সুচারুরূপে বিবৃত করতে পারা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান সম্পদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেকালের প্রভাবশালী পশ্চিমা বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের উন্নতি যেমন অতি প্রাচীনকালে সূচিত হয়েছিল, তার অবনতিও শুরু হয়েছিল সেকালেই। ভূগোল এবং আবহাওয়ার বিশেষ প্রকৃতিই একদা ভারতবর্ষে ধনসঞ্চয় নিশ্চিত করেছিল। তার ফলস্বরূপ চতুর্বর্ণ প্রথার উদ্ভব। ওই প্রভুত্বই 'শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল'। পরিণতিতে বিপুল অধিকাংশ মানুষের 'দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব'। এই বিপুল মানুষের অধঃপতন কালক্রমে বাকি বর্ণগুলোরও পতনের কারণ হয়েছিল। প্রশ্ন হল, যে অবস্থা 'অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল', তার প্রতিবিধানের কোনো উপায় কি আছে? ইউরোপের রেনেসাঁর উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম দাবি করেন, এই গতি রোধ করা সম্ভব। উপায়গুলো 'রাজা ও সমাজের আয়ত্ত'। কেন তারপরও বাঙালি কৃষকসমাজের দুর্দশার মোচন হচ্ছে না, সে কারণ বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন পরের পরিচ্ছেদে।

চতুর্থ ও শেষ পরিচ্ছেদের নাম 'আইন' রেখে লেখক নিগূঢ় কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচনাটা তথ্যসমৃদ্ধ, ঐতিহাসিক এবং বাস্তবসম্মত; আবার কোথাও কোথাও আইরনি বা ব্যাজস্তুতির স্তরে উন্নীত হয়েছে। কারণ, বঙ্কিম একদিকে দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত আইন কিভাবে কৃষকের দুরবস্থার কারণ হয়েছে; অন্যদিকে দেখিয়েছেন, যে আইন দুরবস্থা থেকে দুস্থকে বাঁচানোর কথা, সে আইন কিভাবে তার নিপীড়নকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। নির্মম পরিহাসের মতো করে বঙ্কিম দেখাচ্ছেন, যে ইংরেজ-আইনের খ্যাতিতে তার শাসনের প্রধান ন্যায্যতা সেই আইনই কৃষকের জন্য চিরস্থায়ী দুঃখের কারণ হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকান্তরে তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে ওঠা কিছু প্রশ্নের জবাবে পুনরায় নিজের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তকেই যথার্থ সাব্যস্ত করেছেন। কোনো কোনো দিক থেকে এ সিদ্ধান্ত আগের চেয়েও জোরালো। এ অংশে পাচ্ছি '... কর্ণ্ওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দুষ্য।' কিংবা '... জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী,... তদ্রূপ বিশ্বাসের কোনো কারণ নাই।' – এরকম কয়েকটি সিদ্ধান্ত।

২.২

'রায়তের কথা' প্রবন্ধে প্রমথসুলভ হাস্যরস যথেষ্ট আছে, সাজানো-গোছানো বাক্যও বেশ পাওয়া যায়; কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর অন্য অধিকাংশ 'সাহিত্যিক' প্রবন্ধের তুলনায় এ রচনা অধিকতর 'গদ্যধর্মী' – অন্তত বিষয়গত বাস্তবের ধরনের দিক থেকে এবং উদ্দেশ্যের লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণতার দিক থেকে একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠনের তোড়জোড়ের প্রাক্কালে। প্রমথ চেয়েছেন পরবর্তী 'ইলেক্শনের জন্য' একটি 'প্রোগ্রাম' তৈরি করতে, আর ওই কর্মসূচি তিনি সাজিয়েছেন বাংলার রায়তকে কেন্দ্র করে। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়', আর রায়ত 'জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য'। কাজেই, 'বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি'। সে কারণেই 'বাংলার কৃষকের ওরফে বাঙালি জাতির' অবস্থার উন্নতির কথা ভেবেই রাজনৈতিক কর্মসূচি ঠিক করা উচিত।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। একদিকে ভদ্রলোকের সাথে কৃষকের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই – বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র বরাত দিয়ে প্রমথ বলেছেন, সেকালের চেয়ে একালে 'বাংলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে'; অন্যদিকে রাজনৈতিক পক্ষগুলো, সে 'মডারেট' হোক আর 'এক্সট্রিমিস্ট' হোক, কৃষককে কেন্দ্রে রেখে কর্মসূচি দিতে নারাজ। কারণ হয়ত এই, 'প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন', এমন লোকের সংখ্যা ঢের বেশি।

কাজটা সহজ না হলেও প্রয়োজনীয়। পুনরায় বঙ্কিমের শরণাপন্ন হয়ে প্রমথ জানাচ্ছেন: বঙ্কিমের কালে প্রজার পরিণতি ছিল তিনটি – দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্ব। জমিদারদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দেয়া ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পত্রের বরাত দিয়ে প্রমথ দেখিয়েছেন, প্রজার পূর্বোক্ত তিন অবস্থার কোনোরূপ বদল হয়নি। ফলে এমন কর্মসূচি আনা দরকার যাতে পরিস্থিতির বদল ঘটে।

কর্মসূচির দেখা তিনি পেয়ে গেছেন 'ইংলিশম্যান কাগজে'। বিহারের প্রজাবর্গ নিজেরাই নিজেদের জন্য ওই কর্মসূচি খাড়া করেছিল। তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, ভূমিতে গাছ কাটা, পুকুর খনন ও কোঠাবাড়ি গড়ার অধিকার, দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রই 'আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য' হওয়া ইত্যাদি কয়েকটি ধারা ছিল। প্রমথ চৌধুরী আলাদা করে প্রতিটির তত্ত্ব-তালাশ করে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন,

দাবিগুলো খুবই ন্যায্য এবং বাস্তবসম্মত। কাজেই এগুলো সব পক্ষের কর্মসূচি হিসাবেই গৃহীত হওয়া দরকার।

মুশকিল হল, 'যতদিন স্টেটের সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহাল থাকবে' – এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দেয়ার মতো লোকের অভাব। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু মনে করেন, 'ইংরেজিতে যাকে বলে peasant proprietor,' বাংলার রায়তের তাই-ই হয়ে ওঠা দরকার। এতে জমির উপর রায়তের যতটা হক প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মোটেই নতুন কিছু নয়। ব্রিটিশপূর্ব জমানায় এ বস্তু ছিল; আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে – প্রমথের মতে, তাড়াহুড়ায় আর অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে – তা প্রতিষ্ঠিত না হলেও কর্তাব্যক্তিরা বরাবরই এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। এই যে জমির উপর কৃষকের মালিকানার ধারণা, বহুদিনের অনভ্যাসে লোকে যাকে অবাস্তব বলে ভাবে, ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তসমেত তার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রমথ প্রবন্ধের বাকি অংশ ব্যয় করেছেন। এঁকেছেন ব্রিটিশপূর্ব জমানায় জমির মালিকানার ধরন, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গঠনপর্বের মূলনীতি এবং তার ঐতিহাসিক বিচ্যুতির ছবি। দার্শনিক-রাজনৈতিক দিক থেকে এবং কার্যকরতার দিক থেকে এ অংশই 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

৩.১

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধতি বেশ পরিচ্ছন্নভাবেই আঁকেন বঙ্কিম : 'এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষে।' [দেশের শ্রীবৃদ্ধি] এই দেখানোর কাজটা বঙ্কিম ঈর্ষণীয় মুনশিয়ানার সাথেই করেছেন। করতে পেরেছেন। সে এতটাই যে, রাজনৈতিক-দার্শনিক প্রশ্ন মুলতুবি রেখে যদি শুধু সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করা হয়, অর্থাৎ প্রবন্ধের প্রকাশক্ষমতা, যুক্তির কার্যকরতা এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতার দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে তা অতি উচ্চাঙ্গের রচনা হিসাবে আদৃত হবে।

এই প্রকাশ্য পদ্ধতির গভীর-গোপনে অন্য যেসব পদ্ধতিগত প্রশ্ন ক্রিয়াশীল আছে, অর্থাৎ যে ভাবপ্রবাহের ভিত্তিতে বঙ্কিম তাঁর কথামালা সাজান সেগুলোর অনুসন্ধান জরুরি। যেমন, দেখা দরকার, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের পক্ষগুলো কী কী এবং পক্ষগুলোর আনুপাতিক সামঞ্জস্য বা অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে কি না।

৩.১.১

প্রথমেই দেখা যাক লেখকের অবস্থান কোথায়? প্রথম পরিচ্ছেদে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের দুরবস্থা বর্ণনার পর লেখক প্রশ্ন ছুঁড়েছেন 'চসমা-নাকে বাবু'র দিকে:

'তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ?' একই প্রশ্ন তাক করেছেন শাসক 'ইংরাজ বাহাদুরে'র প্রতিও। তাহলে লেখকের অবস্থান নিশ্চিতভাবে এদের বাইরে। তিনি বুদ্ধিজীবী, বা নিদেনপক্ষে এমন 'মানবতাবাদী' যিনি একদিকে অবস্থাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারেন, অন্যদিকে কৃষকের দুরবস্থার দিকে সহমর্মীর মতো তাকানোর হৃদয়ও তাঁর আছে। অংশত একজন 'জাতীয়তাবাদী' হিসাবেও এ অবস্থানকে দেখার সুযোগ আছে, যিনি তাঁর 'জনগোষ্ঠী'র কল্যাণ চান। 'জমীদার' পরিচ্ছেদে নিজের অবস্থান তিনি আরো পরিষ্কার করেছেন। বলেছেন, জমিদারকুলের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে যে তিনি কৃষকের দুরবস্থার কথা লিখেছেন তার কারণ, কৃষকেরা একদিকে দুর্দশাগ্রস্ত, অন্যদিকে নিজেদের কথা জানানোর ক্ষমতাও তাদের নেই। তিনি জানিয়েছেন, এভাবে লেখার কারণে তিনি জমিদার তো বটেই, এমনকি 'বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন'ও হয়ে উঠবেন। তার অর্থ এই যে, উঁচুশ্রেণি থেকে তিনি আলাদা; আলাদা এমনকি নিজশ্রেণি থেকেও। আলাদা হয়েছেন কার্যত দায়িত্ববোধ থেকে। তবে মনে রাখা দরকার, কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিতকরণে কৃষকপক্ষের কোনো স্বর তিনি ব্যবহার করেননি।

শেষ পর্যন্ত নানামাত্রিক নৈতিক বরাতই তাঁর নিজের দিক থেকে নিজের অবস্থানের প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের এই বাক্যে: 'যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে।' এ প্রসঙ্গে *বঙ্গদর্শনে*র দায়িত্ব সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন তিনি: 'যদি... বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে, – পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে, – যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল।' দুটি বিষয় এখানে অতি স্পষ্ট। এক. দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে অন্তত 'কথা বলে' দায়িত্ব পালন করা বঙ্কিম জরুরি মনে করেন। দুই. তিনি স্পষ্টতই হিতবাদী এবং উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নিজের অবস্থানটা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করলেও অন্য দুই সক্রিয় পক্ষের – ইংরেজ শাসক এবং জমিদার – সাথে নিজের সম্পর্ক প্রবন্ধটিতে মোটেই স্পষ্ট হয়নি। এই দুই পক্ষের সাথে প্রবন্ধের মূল কিন্তু নিষ্ক্রিয় পক্ষ কৃষকের সম্পর্কের খতিয়ানটাও যথেষ্ট ঘোলাটে। অথচ যে প্রস্তাব প্রবন্ধটিতে উপস্থাপিত হয়েছে, তার কার্যকরতার জন্য ওই সম্পর্কগুলোই বেশি জরুরি।

৩.১.২

ইংরেজপক্ষ সম্পর্কে বলা যায়, শাসক ইংরেজের দায় এবং দায়িত্ব শনাক্তকরণে প্রবন্ধটি যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অবশ্য যথার্থ নয়।[৪] তবে সিদ্ধান্তটি

মজবুত: 'ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী"'। বস্তুত এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ১৭৯৯ সালে ৭ নং রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালাকানুন বলে পরিচিত এই 'হফতম' আইন জারির পর মাটিতে প্রজার অধিকার বলে আর কিছুই থাকেনি (সিরাজুল ২০০২ : ১২৮-২৯)। বঙ্কিমের বিবরণীতে এই আইনের কথা নেই। কিন্তু আছে এর পরের কয়েকটি আইন ও রীতির শনাক্তি, যেগুলোর মধ্য দিয়ে, তাঁর ভাষায়, 'প্রতি বারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন'। আইনের শাসনের দোহাই দিয়ে প্রজাকে বলা হয়েছে আইনের আশ্রয় নিতে। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত পাঁচ দফা কারণ নির্দেশ করেছেন যাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, আইন ও বিচারব্যবস্থার 'অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা' কার্যত অবিচারকেই উৎসাহিত করে। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সেকালে এবং পরে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী রচনা করেছেন তাঁরা একই রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেইন খান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পুরোনো কাজির বিচার আর নবপ্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিচারব্যবস্থা জনগণের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ (Khan 1926 : 182-83; 199; 211)। স্পিয়ার একটি কৌতুককর মন্তব্য করেছেন, যেখানে ঔপনিবেশিক আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। মন্তব্যটি এরূপ: 'The courts were to the public a great penny in the slot machine whose working passed man's understanding and from which anything might come except justice.' (1951 : 95)

দেখা যাচ্ছে, সমসাময়িক নথিপত্র এবং পরবর্তীকালীন গবেষণায় ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রশাসন, আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার সাথে বঙ্কিমের শনাক্তি হুবহু মিলে যায়। কিন্তু যথার্থ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে তাঁকে অনবরত সাফাই সাক্ষ্য দিতে হয়েছে। বারবার বলতে হয়েছে, ইংরেজশাসনই বাংলার উন্নতির কারণ, ইংরেজরা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি। তিনি জানতেন, ১৭৯৩ সালের 'ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে'। কিন্তু ভ্রান্তিটা যে খোদ ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত, সে সত্য হয় তিনি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, নয়তো উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। পরবর্তীকালের বিশ্লেষকরা সাধারণভাবে উপনিবেশিত বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এ অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সরল সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিয়েছেন।[৫] তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, মনে মনে অন্য অবস্থান পোষণ করলেও ইংরেজশাসনের ভীতিজনিত কারণে প্রকাশ্যে ওই বুদ্ধিজীবীরা সত্য উচ্চারণ করতে পারেননি। এ বিবেচনা-পদ্ধতি কেবল অনৈতিহাসিক নয়, তত্ত্বীয়ভাবে বিভ্রান্তিকরও বটে। অনৈতিহাসিক, কারণ, বিশ শতকের গোড়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে ইংরেজশাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

কেবল কৃষক, আদিবাসী ও অন্য নানা ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত একজনও পাওয়া যাবে না, যিনি এমনকি অংশতও ইংরেজশাসন সম্পর্কে বিরূপ ছিলেন। তত্ত্বীয় বিভ্রান্তি এই যে, কোনো শাসনব্যবস্থার সমালোচনা ওই শাসনের প্রতি অনীহা নয়। বরং শাসনটিকে তুলনামূলক নিখুঁত আর দীর্ঘস্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষাটাই তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। 'স্বাধীন' দেশের শাসনামল সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। বস্তুত উনিশ শতকের বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজশাসন-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত-চিত্রিত করার যে রেওয়াজ তা 'কালাতিক্রমী দোষে' আক্রান্ত সমস্যা। পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী জমানায় আরোপের কারণেই এ সমস্যা তৈরি হয়।

রণজিৎ গুহ তাঁর *নীল-দর্পণ*-সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রবন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির এ সংকটের একটি তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক সমাধান দিয়েছেন (2009)। তিনি দেখিয়েছেন, *নীল-দর্পণ* এবং সংশ্লিষ্ট বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, অন্তত ভদ্রলোকসমাজের দিক থেকে, মোটেই ইংরেজশাসন-বিরোধিতা নয়, বরং তুলনামূলক লিবারেল পরিসরে সুশাসনের গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি একমাত্র ইংরেজ শাসনেই সম্ভব। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই বোঝা যাবে, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজশাসনের স্তুতি করে যেসব অংশ লিখেছেন সেগুলো 'সত্যে'র আড়াল তো নয়ই, বরং গভীরতর 'সত্যে'র প্রকাশ। আরো বোঝা যাবে, ওই পরিস্থিতিতে যতটা বলা যেত কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ততটাও বলেননি। যেমন, কৃষকের সাথে জমিদারের চিরস্থায়ী সম্পর্কের কথা উত্থাপনের সাথে ইংরেজ-বিরোধিতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি মনেও করতেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল।' [আইন] তবু প্রস্তাব হিসাবে তাঁর কাছ থেকে অনুরূপ কোনো কথা শোনা যায়নি। কেন যায়নি তা বোঝা যাবে এ প্রবন্ধের অন্য এক প্রবল পক্ষ জমিদার সম্পর্কিত আলোচনায়।

৩.১.৩

জমিদার-সম্পর্কিত বিচিত্র উল্লেখে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি স্বভাবতই আকীর্ণ। এসব উল্লেখের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রবন্ধের শেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী', এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন, অত্যাচার-নিপীড়ন নায়েব-গোমস্তরা করে, এরকম বলে পার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ, নায়েব-গোমস্তার বেতন কম ধার্য করে এবং তাদের অত্যাচারের তত্ত্বতালাশ না রেখে জমিদার স্বয়ং অত্যাচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখে। কিন্তু ওই অধ্যায়ের শেষে আসলে বঙ্কিম জমিদারকুলকে সম্পূর্ণ রেয়াত দিয়েছেন। বলেছেন, যাদের উপার্জন কম কেবল সে ধরনের জমিদাররাই এ অত্যাচার করে থাকে। এদের অনেকেই আবার জমিদার নয়, 'করগ্রাহী' মাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অত্যাচার-নিপীড়ন জমিদারের অজান্তেই ঘটে।

অন্যত্র আবার বলেছেন, 'সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই – যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ।' [জমীদার]

তাহলে আগে যে বলেছেন, জমিদারেরা উদাসীন থেকে এবং নায়েবের বেতন কম ধার্য করে অত্যাচার করতে দেন, সেই সিদ্ধান্ত কাদের জন্য? তাছাড়া যদি এত এত 'সুশিক্ষিত' জমিদারই বাংলার রায়তকুলের অভিভাবক হন, তাহলে নিপীড়িত রায়তকুলের এত প্রাচুর্য কোত্থেকে আসে, যে দুরবস্থার কথা বঙ্কিম নিজেই অন্য যে কারো চেয়ে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধেই? কিছু জমিদার ভালো, কিছু জমিদার প্রভাবশালী, কিংবা কারো কারো সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে – এসব তথ্য কি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ওই অসামঞ্জস্য এবং অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারে? আসলে সমস্যা খুঁজতে হবে ওই বাস্তবতায়, যেখান থেকে খোদ প্রবন্ধটি জন্ম নিয়েছে।

৩.১.৪

কলকাতার ভদ্রলোকসমাজে কৃষকদের নিয়ে লেখালেখির সূত্রপাত হয়েছিল ইয়ংবেঙ্গলদের আমলে (নরহরি ১৯৯৭)। ১৮৫০-এর দিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ সম্পর্কে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল (বদরুদ্দীন ২০১৩: ১৯-২১)। এ বিষয়ে অন্য গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোর মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Zemindar and the Ryot' (১৮৪৬), কিশোরীচাঁদ মিত্রের *The Ryot and The Zemindar* (১৮৫৯), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *Bengal Ryots* (১৮৬৪), কেশবচন্দ্র সেনের 'প্রজাদিগের দুরবস্থা' ও 'প্রজাপীড়ন' (১২৭৭) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের *The Peasantry of Bengal* (১৮৭৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ভবতোষ ২০০৮ : ৪৫, ৫৭)। এর মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের বই বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের এক টীকায় লিখেছেন, 'আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।' তার মানেই হল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি এক ধারাবাহিক সংস্কৃতিরই অংশ। ওই সংস্কৃতিতে রায়তদের নিয়ে উদ্বেগ ছিল, পত্রিকায় লেখার চল ছিল; কিন্তু তাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য কোনো বাস্তব কর্মসূচি ছিল না। তাহলে লেখার অনুপ্রেরণা আসত কোত্থেকে?

দেবেশ রায় এ ধরনের লেখালেখির কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন (১৯৯০ : ৩১১-১৫)। এক. জমিদারদেরও নানা ধরন ছিল। তাদের পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধ ছিল। ফলে এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরোধিতায় কৃষকের কথা এনেছে। দুই. সাহেবরা,

বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকরা, কোম্পানির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা বলেছে। তাতে স্বভাবতই কৃষকের কথা ছিল। কারণ তারাই ভারতের পনের আনা। তাদের এই সমালোচনাগুলো বাঙালিদের প্রভাবিত করে থাকবে। তিন. উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা নাগরিক বাঙালির কাছে যে নতুন মূল্যবোধ উপস্থিত করেছিল, সেই মূল্যবোধই ছিল কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির একটি উৎস। তাই একই ব্যক্তি জমিদার হয়েও, জমিদারি চালিয়েও, কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এঁদের বিশ্বাসের জগৎ আর ব্যবহারিক জগতে ফারাক ছিল। তাই কথার সূত্রে কাজে কেউ অগ্রসর হয়নি। জমিদার-কৃষক সম্পর্ক নিয়ে এত লেখা হলেও কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ বা কোনো প্রজার প্রতি অত্যাচারের নির্দিষ্ট ঘটনা খুব একটা ছাপা হয়নি। অথচ নামধাম ও ব্যক্তিগত তথ্যসহ লেখাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। 'ফলে মনে হয়, স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির মতো আদর্শ সামাজিক কর্মসূচিরই অংশ হিশেবে কাগজেপত্রে কৃষকদের প্রতি এত বেশি সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। পরিচিত বিষয় হিশেবে এর সাংবাদিক মূল্য ছিল কিন্তু এর কোনো সামাজিক কর্মসূচিগত তাৎপর্য হয়ত ছিল না'। (দেবেশ ১৯৯০ : ৩১৫)

দেবেশ রায়ের এই বিশ্লেষণ 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে, বিশেষত জমিদার-প্রসঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বেলায়, ভালোভাবেই খাটে। এ প্রবন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে, '১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, ... সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে'। আমরা আগেই দেখেছি, কৃষকের দুর্দশার বর্ণনায় বঙ্কিমের সহানুভূতি অতুলনীয়; দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যায় তিনি অনন্য। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? বঙ্কিম কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন চান না : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি'। [আইন] এরপর তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে তাঁর এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। লিখেছেন, 'বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না'। তখন দুই-একজনের লেখায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোগত সংস্কারের দাবি উঠছিল। সন্দেহ হতে পারে, কোনো আমূল সংস্কারের বদলে উপদেশ-অনুরোধে সমস্যাগুলো কমিয়ে আনার পরামর্শ দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসামান্য লেখার মূল প্রেরণা। তাঁর পরামর্শ ছিল: প্রজার প্রতি জমিদারদের দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, আর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যেন দুষ্ট জমিদারদের কর্মকাণ্ড তদারক করে (Chatterjee 1993 : 63)।

৩.২

'রায়তের কথা' প্রবন্ধের জটিলতা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের তুলনায় কম। তার এক কারণ হয়ত এই, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর যে অংশ উভয় প্রবন্ধের লক্ষ্য তা বঙ্কিমের কালে অবিকশিত গঠনপর্বে ছিল এবং ইংরেজশাসনের স্পর্শকাতরতায় এবং প্রতাপশালী জমিদারদের নিরঙ্কুশ ছত্রছায়ায় ছিল। প্রমথ চৌধুরীর কালে শাসনের ঘরোয়া অংশে স্থানীয়দের প্রতাপ বেড়েছে, যেমন সমাজে প্রতাপ কমেছে জমিদারদের। মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বয়স এবং গভীরতা বেড়েছে। ফলে লেখকের ভঙ্গি ও স্বরে আবেদন বা আবদারের বদলে যুক্তিতে বশীভূত করার প্রবণতা স্পষ্ট। লক্ষণীয়, যে কথাগুলোকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার দায় বোধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রবন্ধে বিশদভাবে তা উপস্থাপন করে নিজের কথা বা প্রস্তাবের ভিত্তি খাড়া করেছেন, সে ধরনের অনেক কথা প্রমথ 'সত্য' বা 'প্রতিষ্ঠিত' ধরে নিয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বিবেচনার পদ্ধতি এবং লক্ষ্য ভিন্ন হলেও এবং কোথাও কোথাও এমনকি বঙ্কিমের অবস্থান নিয়ে মৃদু রসিকতা করলেও[৬] বঙ্কিমের প্রবন্ধটি যে প্রমথের সামনে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বারকয়েক তিনি ওই প্রবন্ধ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন; যদিও মনে রাখা দরকার, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের দিক থেকে প্রমথের প্রবন্ধটি বঙ্কিমের কাছে কোনো আবশ্যিক অর্থে ঋণী নয়।

প্রমথ চৌধুরী দাবি করেছেন, তাঁর কালে ভদ্রলোকসমাজের সাথে কৃষকের দূরত্ব বঙ্কিমের কালের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কথাটা আসলে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই অধিকতর সত্য। রায়তের সাথে তাঁর নিজের সংশ্লিষ্টতার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রবন্ধে নেই। তিনি রায়তের দুর্দশার ফিরিস্তি দিয়েছেন সংক্ষেপে – প্রধানত অন্যের বরাত দিয়ে; আর রায়তকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য কোনো হাহাকারও করেননি। কেবল জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক ভদ্রসমাজকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যারা দেশের উন্নতি চান তাদের উচিত কৃষকের উন্নতির দিকে নজর দেয়া। কারণ যথার্থ অর্থে কৃষকরাই 'দেশ'। এমনকি এ কথাটা ভদ্রলোকদের মানানোর কোনো মরিয়া চেষ্টাও তাঁর মধ্যে ছিল না। বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের নিরাসক্তি বজায় রেখে তিনি শুধু তাঁর যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছেন।

তাঁর সন্দর্ভে শাসক ইংরেজ কোনো সক্রিয় পক্ষ নয়। তারা শুধু হাজির আছে অতীতের কৃতকর্মসূত্রে; অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণয়নকারী হিসাবে। ওই বন্দোবস্তে কৃষকের অধিকার রক্ষিত না হওয়ায় তিনি তাদের দুষেছেন। কিন্তু সেটাও তাঁর কাছে খুব বড় সমস্যা নয়। কারণ, এখন তা দেশীয় ব্যবস্থাপকরা 'আমাদের পার্লামেন্ট বসবামাত্র... একদিনে পূরণ করে দিতে' পারে।

অন্যদিকে জমিদারেরাও আসলে গুরুতর পক্ষ নয়। প্রমথের বিশ্বাস, 'প্রজার স্বত্বের দাবি মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না।' তাঁর এ বিশ্বাসের ভিত্তি কী? ভিত্তিটা জন্মসূত্রে পাওয়া : '... আমার আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার...।

আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়।' [প্রোগ্রামের পরিচয়] প্রমথ চৌধুরীর এ দাবি সাধারণভাবে 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের আলোচকরা মেনে নিয়েছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬ : ১৪৯) লিখেছেন, 'আপন শ্রেণিচেতনার অহমিকাগর্ব থেকে তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন, জমির উপর রায়তের স্বত্বস্বামিত্ব স্বীকার করেছিলেন।' অধীর দে (১৩৬৬ : ৪১২) লিখেছেন, 'প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং জমিদার ছিলেন; অথচ জমিদারী প্রথার তীব্র ও তীক্ষ্ণ সত্যনিষ্ঠ সমালোচনায় তাঁহার নিরপেক্ষ, নিরাবেগ ও নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর।'

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, প্রমথের নিজের দাবি এবং সমালোচকদের স্বীকৃতি দুটিই ভিত্তিহীন। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই জমিদারশ্রেণির পক্ষ হয়ে কথা বলার অধিকার জন্মে না বা ছাড়পত্র মেলে না। প্রতিনিধিত্বের সনদ ও স্বীকৃতি থাকা চাই। জমিদার পরিবারের সন্তানের প্রজা-আন্দোলন করার বা বিপ্লবী রাজনীতি করার বিস্তর ইতিহাস আছে। কিন্তু সে ইতিহাস কোনো অর্থেই জমিদারশ্রেণির ইতিহাস নয়। আর পূর্বোক্ত দুজন সমালোচকের মন্তব্য সম্পর্কে বলা দরকার, এ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী আসলে জমিদারের অবস্থান বা দাবি বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো প্রকার ছাড় দেননি। জমিদারি প্রথা লোপ করারও প্রস্তাব করেননি। তিনি চেয়েছেন, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, জমির উপর রায়তের 'রায়তসুলভ' মালিকানা – peasant proprietorship। প্রজার উপর জমিদার অত্যাচার করে – এ তথ্যই তিনি আসলে কবুল করেননি। বলেছেন, 'জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন, সে আক্রমণ করতে আমি অপারগ, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়।' [প্রোগ্রামের পরিচয়] তার মানেই হল, দুর্বৃত্ত জমিদারের সংখ্যা তিনি এতই নগণ্য ভেবেছেন যে তাকে আমলে না আনলেও চলে। পুরো প্রবন্ধে জমিদারশ্রেণিকে তিনি রুচিশীল এবং উদার হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলুপ্তি এবং তার ফলে বাংলার রায়তের সম্ভাব্য উন্নতির প্রস্তাব তিনি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ, খাজনা চিরস্থায়ীভাবে স্থির থাকায়, তাঁর মতে, এ পদ্ধতিই দেশের জন্য মঙ্গলকর। তাহলে, জমিদারি অক্ষুণ্ন থাকবে, অথচ কৃষকের মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে – প্রমথের এ প্রস্তাবের মানে দাঁড়ায়, কৃষকের সাথে জমিদারের খাজনাও স্থিরনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, এবং জমির মালিকানার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রায়ত ভোগ করবে।

কোথাও পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রবন্ধের বর্ণনাধারা অনুসরণ করলে বোঝা যায়, দুটি অনুমান থেকে প্রমথ চৌধুরী এই প্রস্তাবের মুসাবিদা করেছেন। এক. জমিকেন্দ্রিক উৎপাদনের পুরো কারবারে মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ রাখতে পারলে রায়তের ভাগ বাড়বে। দুই. জমিদারির পুরনো ধারণা, যে ধারণার বিবরণী বঙ্কিমের প্রবন্ধে আছে, ১৯১০-এর দশকে আমূল বদলে গেছে। এবং জমিদার পরিবারগুলো আসলে স্বাধীন

পেশার উপর আর্থিকভাবে যতটা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল, জমির উপর ততটা ছিল না।

৩.২.১

চিন্তাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক সম্ভবত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেই কর্মসূচির ক্ষেত্রে রায়তের মনোভাবকে পরম গুরুত্ব দেয়া। দুটিই বাংলা অঞ্চলের ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের রায়তচিন্তার ইতিহাসের দিক থেকে রীতিমতো বৈপ্লবিক ঘটনা। আমরা আগেই দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্রসহ সেকালের ভাবুকদের লেখালেখিতে সহানুভূতি যতটা ছিল তৎপরতার পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না – কর্মসূচি প্রণয়ন তো অনেক পরের উদ্যোগ। অন্যদিকে যার সংকট তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন এমনকি পরবর্তী বহুদিনের সাপেক্ষেও তাত্ত্বিকভাবে অগ্রসর চিন্তা। বিহারের কৃষকদের ওই কর্মসূচি পত্রিকায় পাওয়া হয়ত প্রমথের জন্য কাকতালীয়, কিন্তু তিনি যেভাবে ব্যাপারটাকে বাংলার রাজনীতিকদের কাছে যুক্তিসহ উপস্থাপন করেছেন তাতে বোঝা যায়, কর্মসূচি এভাবেই প্রণীত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাস্তবসম্মত তরিকা অনুসন্ধান করতে গিয়ে এবং এ ব্যাপারে ভদ্রলোকসমাজের করণীয় নির্ধারণ করতে গিয়ে এরপর তিনি আবিষ্কার করেন, জমির উপর রায়তসুলভ মালিকানাই কেবল এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেড়শ বছরের ইতিহাস ভদ্রলোকদের এ কথা ভাবতেই অভ্যস্ত করে তুলেছে যে, জমির উপর জমিচাষির কোনো অধিকার থাকতে পারে না। প্রমথ জানেন, এ অধিকার ব্রিটিশপূর্ব জমানায় ছিল, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে এর প্রণেতারা আইনভুক্ত না করলেও এ অধিকার থাকা উচিত বলেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে', সে কথার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার জন্যই প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের বাকি অংশ ব্যয় করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, ১৭৯৩-র বন্দোবস্তে জমিদার জমির উপর যে ধরনের স্বত্ব পেল তা নজিরবিহীন। কেননা মোগল বা নবাবি আমলে এরকম মালিকানার নজির মেলে না। পূর্ববর্তী জমানায় জমির উপর কৃষকের যে ধরনের স্বত্বের পরিচয় প্রমথ দিয়েছেন তাতে সম্ভবত বেশ কতকটা অতিশায়ন আছে। কিন্তু জমির উপর রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব সত্ত্বেও প্রজার যে মালিকানাস্বত্ব ছিল এবং প্রজা যে জমি বিক্রি করতে পারতেন তার যথেষ্ট নথিপত্র পাওয়া যায় (Habib 1999 : 151)। এই অধিকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রক্ষিত হওয়ার কথা ছিল, তা যুক্তি আকারে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রমথ চৌধুরী এরপর ওই বন্দোবস্তের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। 'তাঁর হাতে এ বর্ণনা সাহিত্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার ইতিহাস-মূল্য নষ্ট হয়নি' (অরুণকুমার ২০১৬ : ১৫০)। তার

প্রমাণ এই যে, দর্শনের দিক থেকে এবং প্রক্রিয়ার দিক থেকে পরবর্তীকালের গবেষণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে বিবরণী উঠে এসেছে (Guha 2016), প্রমথের বিবরণী তার সাথে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ। প্রমথের লক্ষ্য অবশ্য ছিল ফ্রান্সিস এবং কর্নওয়ালিশের – যারা, প্রমথের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথাক্রমে জনক ও জননী – কৃষকবান্ধব মতের প্রেক্ষাপট উন্মোচন করা এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই মূলনীতির বাইরে গিয়ে কৃষক জমি থেকে তার অধিকার হারিয়েছিল তার স্বরূপ চিহ্নিত করা। তিনি তা সাফল্যের সাথেই করতে পেরেছেন। ফলে তাঁর এ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কৃষকের সাথে চিরস্থায়ী খাজনা বেঁধে দিয়ে ভূমিতে কৃষকের অধিকার সাব্যস্ত করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লঙ্ঘন নয় মোটেই, বরং বহুদিনের লঙ্ঘিত সত্যের পুনর্বহাল মাত্র। স্পষ্টতই বঙ্কিম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে 'সত্য' রক্ষার জন্য মরিয়া ছিলেন, প্রমথের সিদ্ধান্ত তার 'কাউন্টার-থিসিস'।

৪

'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'রায়তের কথা' প্রবন্ধ দুটির স্থান-কালের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা হিসাবে কৃষক-আন্দোলনের উল্লেখ জরুরি। ব্যাপক কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিতেই আসলে ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের প্রজা-আইন করা হয়েছিল (বদরুদ্দীন ২০১৩ : ২৬)। এর মধ্যে ১৮৫৯-এর উদ্যোগ যে প্রকৃত কোনো ফল দেয়নি সে বিষয়ে সকল ভাষ্যকারই একমত। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর প্রবন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থের বরাত দিয়ে। আর প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন, ১৮৫৯-এর আইনসহ ওই আইনের পরবর্তী সংস্কারগুলোও, অর্থাৎ ১৮৮৫-র আইনও, কেবল মামলার সংখ্যা বাড়িয়েছে, প্রজার কার্যত কোনো উপকার করেনি।[৭] ফলে কৃষক-বিদ্রোহ বাড়ছিল। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, প্রজা-সমিতি ও প্রজা-আন্দোলনের বিস্তারের প্রেক্ষাপটে। বিস্ময়কর নয় যে, তাঁরা দুজনই রায়তের এসব তৎপরতার চাপের কথা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং যেখানে করেননি, সেখানেও তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা যে অনেকদূর পর্যন্ত ওই বাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশের উন্নতি হয়েছে বলে আহলাদিত হতে পারেননি, কারণ, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের উন্নতি হয়নি। কৃষকের উন্নতি দরকার কেন? বঙ্কিম 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অংশে এক চকিত মন্তব্য করেন : '...দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।... সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?' স্পষ্টতই কৃষক-বিদ্রোহ বঙ্কিমের রায়তভাবনার একমাত্র না হোক অন্যতম প্রধান উৎস। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সমধর্মী উল্লেখ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধেও বিস্তর পাওয়া যায়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব' অংশ থেকে একটি মন্তব্য উল্লেখ করা গেল :

> গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নূতন ঘর বাঁধতে শুরু না করি, তাহলে দু'দিন বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।

এই প্রকাশ্য প্রবল বাস্তবের বাইরে ওই বাস্তবেরও নিয়ন্ত্রক আরেক বাস্তব প্রবন্ধ দুটির মূল নিয়ন্তা। সেটা হল ঔপনিবেশিক শাসনের বাস্তবতা। আমরা এখন বাস্তবতার এই তলে প্রবন্ধ দুটির স্থান-কাল এবং চিন্তাপদ্ধতির হদিশ নেব।

৪.১.১

বঙ্কিমের প্রবন্ধটি উপনিবেশিতের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনাপদ্ধতির এক উৎকৃষ্ট নজির। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি দেশের উন্নতির এক লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। এই ফর্দের ভিত্তি ইংরেজ-পূর্ব জমানার বাস্তবতা। বর্তমান কালের বিবরণীতে ঠিক ওই স্বরই ফুটে উঠেছে যা ঔপনিবেশিক শাসনের মজ্জাগত। যেনবা, এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের আগে যা কিছু ছিল তার সবই পশ্চাৎপদ এবং অনুল্লেখ্য। বিজ্ঞানের উন্নয়নে মানুষের জীবনমানের যে বিস্ময়কর উন্নতি আধুনিক কালে হয়েছে লেখক তাকে বর্তমান শাসনের এবং শাসকদের অবদানই মনে করেছেন। তখন হয়ত এটা ভাবা খুব সহজ ছিল না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন ব্যবসায়-উদ্যোগ হিসাবে অনূদিত হয়, তখন তার নিজের স্বার্থেই সে দুনিয়াজুড়ে খদ্দের সন্ধান করে। সেভাবেই কেবল তা বাণিজ্যিক সাফল্যের মুখ দেখতে পারে। আজকাল খুব সহজেই বলা সম্ভব, জাপান এবং চীন-যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ জীবনযাপনের নানা আয়োজনে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, এবং তা কিছুতেই সময়ের দিক থেকে ভারতবর্ষের পরে নয়, পশ্চিমা শাসন না থাকাটা তার জন্য বাধা প্রমাণিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য শুধু উপকরণগত উন্নতির দোহাই দেননি। জ্ঞানগত উন্নতিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত বিজ্ঞান ও দর্শনের বৈপ্লবিক বদলের কথা বলেছেন। কথাগুলো মোটেই বাড়িয়ে-বলা নয়। সমস্যা সাকুল্যে দুটি। এক. আগের যুগের অন্ধকারের বিপরীতে এই নতুন আলো উপস্থাপিত হয়েছে। দুই. এমন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যেন এই উন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শাসন আবশ্যিক ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন তার নিজের প্রয়োজনেই উপনিবেশিতের মনে তৈরি করে হীনতার বোধ (মোহাম্মদ আজম ২০১৪: ৮৬-৯১)। ভারতীয়রা হীন এবং নিজদেশ শাসনে অক্ষম – এ বোধ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতার ভদ্রলোকসমাজের মনে জেঁকে বসে। ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত 'সুশাসন' ডিসকোর্সের সহোদর এই দৃষ্টিভঙ্গি এত গভীর এবং প্রবল যে সেকালের সবচেয়ে মেধাবী বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রও তা থেকে মোটেই মুক্ত থাকতে পারেননি। হয়ত চানওনি। তাঁর পুরো প্রবন্ধের অন্যতম ভিত্তি ইংরেজের 'সুশাসন': 'ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত'। বিবরণীতে অবশ্য সুশাসনের

স্থলে দুঃশাসনের চিত্রও বড় কম প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুশাসনের সুরটিই চওড়া রয়ে গেছে। সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এরকম: দুঃশাসন দূর করার জন্য আর্জি জানানো যায় তার কাছেই যে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষমতা রাখে। বিশ শতকের আগে কলকাতার ভদ্রলোকশ্রেণির মধ্যে চিন্তার এই ব্যাকরণের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

৪.১.২

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের উৎকৃষ্ট নমুনা। ব্যাপারটা মোটেই এ নয় যে, বঙ্কিম তাঁর তত্ত্বীয় ভিত্তিগুলো তৈরি করেছেন পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনে; এমনকি এ-ও নয় যে তিনি ব্যবহার করেছেন ওই সমস্ত উপকরণ যেগুলো উপনিবেশ আমলের প্রভাবশালী ডিসকোর্স হিসাবে ওই শাসনকেই বৈধতা দেয়; বরং ওই উপাদানগুলো ব্যবহার করে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত ও 'জ্ঞান' উৎপাদন করেছেন সেগুলো ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে উৎপাদিত সিদ্ধান্তের সাথে হুবহু মিলে যায়। আমরা এরকম তিনটি উদাহরণ উপস্থাপন করব।

এক. 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। এর প্রথম কয়েক বাক্য নিম্নরূপ:

> আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত।

এ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের জন্য তিনি সেকালের অগ্রসর জ্ঞানকাণ্ডের যে দুটি ক্ষেত্র ব্যবহার করেছেন তার একটি 'রাজনৈতিক অর্থনীতি', অন্যটিকে বলতে পারি 'মানবপ্রকৃতির সাথে বাহ্যবস্তুর সম্পর্কবিচার'। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে সভ্যতা বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল এবং সভ্যতা বিকশিত হয়েছে সুদূর অতীতে। কিন্তু সেই সভ্যতার অভ্যন্তর এবং বাহ্য পরিস্থিতির মধ্যেই তার বিলয়ের উপাদানগুলোও মজুদ ছিল। ফলে প্রথমে নিম্নশ্রেণি এবং তারপর উচ্চশ্রেণিগুলোর পতন ঘটেছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া কি সম্ভব, যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মই প্রতিকূল? ইউরোপের রেনেসাঁর উদাহরণ থেকে বঙ্কিম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন কিছু নিয়ম 'রাজা এবং সমাজের আয়ত্ত' যে নিয়মগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের বদল ঘটাতে পারে। তিনি লিখেছেন, ইংল্যান্ড সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায় ইংরেজদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, 'উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে'। ইংরেজের সুশাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধির যে সুসংবাদ প্রবন্ধজুড়ে বারবার তিনি দিয়েছেন সেই মঙ্গলই নিঃসন্দেহে ভারতের 'প্রাকৃতিক নিয়মের বদল' ঘটানোর নিয়ামক হয়ে উঠেছে বা উঠবে।

এবার ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের একটি সাধারণ প্রবণতার উল্লেখ করা যাক। উপনিবেশিতদের সুবিধামত চিহ্নিত-চিত্রিত করা এবং নিজেদের উঁচু আর অন্যকে

কোনো-না-কোনোভাবে অধস্তন হিসাবে প্রতীয়মান করা একটি কার্যকর ঔপনিবেশিক কৌশল। অথচ ভারতীয়দের 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেওয়া খুব সহজ ছিল না। 'সভ্যতা'র যে উপাদানগুলোর অভাবে আফ্রিকাকে এক কথায় খারিজ করা গেছে, ভারতে তার সব কটাই ছিল, এবং ভালোভাবেই ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ভারতীয় 'অপর' নির্মাণ আবশ্যক। আশিস নন্দী (1989 : 17-18) লিখেছেন, দুই পরস্পরবিরোধী যুক্তিধারায় তারা এই সমস্যার একটা বিহিত করার চেষ্টা করে। এক. ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তারা ছেদ তৈরি করে। যুক্তিটা দাঁড়ায় এরকম: সভ্য ভারত সুদূর অতীতের ব্যাপার; বর্তমানের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। দুই. ভারতীয় সভ্যতায় কিছু ভালো জিনিস ছিল বটে, কিন্তু তাতে তার ধ্বংসের বীজও ছিল। প্রথম যুক্তির 'ছেদে'র বিপরীতে দ্বিতীয় যুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকতাকে, যদিও তা মন্দের – ভালোর ধারাবাহিকতা নয়। ফলে ভারতের বর্তমান বেহাল দশার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন দায়ী তো নয়ই, বরং এই শাসনই মুমূর্ষু ভারতকে বাঁচিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।

উল্লিখিত বিবরণীর সাথে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলোর প্রায় আক্ষরিক মিল নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়।

দুই. বঙ্কিমচন্দ্র যেসব জ্ঞানজাগতিক পদ্ধতি এ প্রবন্ধে অবলম্বন করেছেন, তার মধ্যে দুটির উল্লেখ আগেই করেছি। এর সাথে যুক্ত হতে পারে কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ এবং মিল-বেন্থামের উপযোগবাদ। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমসাময়িক এসব প্রণালিপদ্ধতির ব্যবহারে তিনি উচ্চাঙ্গের মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাতে ভারতের চেহারা কি ঠিকমতো ফুটেছে? তিনি দেখিয়েছেন, ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যে ভারতের কৃষির উন্নতি হয়েছে। শিল্পখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তা ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হয়নি। কেননা, শিল্প থেকে উৎখাত হওয়া শ্রমিক বর্ধিষ্ণু কৃষিখাতে শ্রম দেবে, তাতে কৃষি-উৎপাদন বাড়বে। প্রশাসকদের বেতনভাতা বাবদ কিছু অর্থ ইংল্যান্ডে যাচ্ছে – এই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। অবশিল্পায়নের বাস্তবতাও চোখের সামনে ছিল। কিন্তু মুক্তবাণিজ্য, বিশেষায়িত উৎপাদনব্যবস্থা আর শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে আর্থিক প্রগতি সম্ভব – এই 'জ্ঞান' তাঁকে অন্যরকম কিছু ভাবতে দেয়নি। তিনি 'উন্নতি'ই দেখতে পাচ্ছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> Thus Bankim's devotion to what he regarded as the fundamental principles of a rational science of economics makes it impossible for him to arrive at a critique of the political economy of colonial rule, even when the evidence from which such a critique may have proceeded was, in a sense, perfectly visible to him. (1993 : 63)

তাহলে যতটা ভাবা হয়, সমস্যার গোড়া তার চেয়ে অনেক গভীরে। গলদটা ভাবনার পদ্ধতিতে। উপনিবেশিতের সবচেয়ে মেধাবীরাও সেই ছাঁচ এড়াতে পারেন না।

তিন. ইংরেজপূর্ব মুসলমান শাসনামল সম্পর্কে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের উপনিবেশিত কলকাতার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমান্তরাল। প্রথম থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের একটা মূল প্রচারণা ছিল, ব্রিটিশরা ত্রাণকর্তা হিসাবে মুসলমানদের দুঃশাসন থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচিয়েছে (Sarkar 2000 : 77)। 'Muslim tyranny myth'-এর ব্যাপারে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মহলে নজিরবিহীন মতৈক্য দেখা গেছে। এ ব্যাপারে অনাচারী ইয়ংবেঙ্গল, যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মতের কোনো অমিল ছিল না (Sarkar 2000 : 19-20)। ইউরোপীয়রা নিজেদের ইতিহাসের যে কালবিভাজন ভারতের ইতিহাসে আরোপ করেছিল, তার অনুকরণে ইতিহাসের মূল কালক্রমটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এরকম যে – অতীতকাল হিন্দু গৌরবের যুগ, মধ্যযুগ মুসলমান দুঃশাসন ও তার পতনের কাল, আর আধুনিক যুগ নবজাগরণের।

বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'আইন'-এ রাজ্যশাসন, জমিদারি এবং প্রজাপীড়ন সম্পর্কে যে ধারাবিবরণী পেশ করেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক। সংস্কৃত উৎস থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না।' কারণ, 'হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন' করতেন। এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে পালটে গেল মুসলমান আমলে। তারা প্রথম জমিদার সৃষ্টি করলেন।[৮] কারণ, 'তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না।' হিন্দু রাজারা যেখানে 'অবলীলায়' কর সংগ্রহ করতেন, সেখানে মুসলমানেরা কর সংগ্রহে অপারগ হয়ে 'কর-সংগ্রহের কনট্রাক্টর' তৈরি করলেন। 'ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি।' ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণ করল প্রজার এই দুরবস্থার কালে। সে 'দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য' তাদের 'ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না', কিন্তু কর্নওয়ালিশ 'মহাভ্রমে পতিত হইয়া' প্রজাদের গুরুতর সর্বনাশ করলেন। তাতে অবশ্য বঙ্কিম হতাশ্বাস নন। ইংরেজরা 'প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী'। ফলে ছয় কোটি বাঙালি কৃষকের জন্য তাদের 'অক্ষয়' রাজ্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভারতের অতীতে আছে হিন্দু গৌরব, মধ্যযুগে মুসলিম দুঃশাসন আর বর্তমানে আছে অসীম সম্ভাবনাময় ইংরেজরাজ্য – এই 'জ্ঞানজাগতিক সত্যে' অনাস্থা পোষণের কোনো কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের দিক থেকে ছিল না।

৪.১.৩

১৮৭২ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ ১৮৯২ সালে সংকলিত হয় *বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ডে*। প্রবন্ধটি এ সংকলনে পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের দ্বিধা ছিল। তবু তিনি ছেপেছেন, এবং ছাপার পক্ষে যেসব কারণ দেখিয়েছেন তাতে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গির বদল সত্ত্বেও প্রবন্ধটির প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। পূর্ববর্তী আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত পুরনো লেখা পরবর্তীকালে হুবহু গ্রন্থভুক্ত করার ঘটনা এত

বেশি ঘটে যে, প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব না দিলেও চলত। কিন্তু প্রধানত 'সাম্য' পুস্তিকার সাথে যুক্ত হয়ে এবং গৌণত গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময়ে ভূমিকাসহ কয়েকটি টীকা যুক্ত হওয়ায় 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র এই নতুন সংস্করণ বঙ্কিম-পাঠের প্রভাবশালী ধারায় স্থান করে নিয়েছে।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ বইতে বঙ্কিমের সম-সাময়িক লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বঙ্কিমবাবু বলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্য'টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।'" (উদ্ধৃত, অরবিন্দ ১৯৭৫ : ১০২) ভুলটা কোথায়, বঙ্কিম তা খুব পরিষ্কার করে বলেননি। তবে অন্য নানা লক্ষণ থেকে মনে হয়, চিন্তাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের প্রভাবকেই তিনি পরে 'ভুল' হিসাবে সাব্যস্ত করেছিলেন। 'সাম্য' এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ সম্পর্কে বঙ্কিমের এই অবস্থানকে সাধারণত তাঁর শেষপর্বের 'রক্ষণশীল' মনোভাব হিসাবে দেখা হয়। 'রেনেসাঁ'র পর 'রেস্টোরেশন' খোঁজার পদ্ধতির সাথেও 'রক্ষণশীল' হিসাবে চিহ্নিত করাটা বেশ মিলে যায়। কিন্তু এভাবে দেখাটা সমস্যাপূর্ণ। কারণ শুধু এই নয় যে, 'আধুনিকতা'র ধারাপ্রবাহের মধ্যে এখানে কোনো 'অনাধুনিকতা' সাব্যস্ত করা হয় না বা করা যায় না, বরং সত্য হল, যে বঙ্কিম উনিশ শতকের ভারতের প্রধান 'চিন্তানায়ক', তিনি মুখ্যত কথিত 'রক্ষণশীল' বঙ্কিম।[৯]

বরং শেষদিকের এই বঙ্কিমকে ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় এক 'অসুখী চৈতন্যে'র ক্লান্তিহীন অনুসন্ধানের পরিণাম হিসাবে দেখাই সঙ্গত। সুদীপ্ত কবিরাজের বিশ্লেষণে ওই বাস্তবতাই ধরা পড়েছে : '... Bankimchandra's reflection had a greater dramatic quality, because of his gradual revision of his earlier enthusiasm for rationalist doctrines: he had a most agitated, tense, self-correcting self to contend with.' (1998 : 162) অবস্থান বদল করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানো বঙ্কিমের মৃদু স্পর্শ আছে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের নতুন সংস্করণে, আর দুই অবস্থানের ফারাক চিহ্নিত করার জন্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (২০১৩) নিম্নোক্ত তরিকাই অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে হয়।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপনিবেশিত কলকাতায় আধুনিকতার এক পর্ব শনাক্ত করেছেন উনিশ শতকের প্রথমাংশে। কলকাতায় ওই সময় একটা মিশ্র নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। সেখানে অ-শাসক ইউরোপীয় আর শিক্ষিত বাঙালি একসাথে নিরত ছিল নানা লিবারেল চর্চায়। তার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন ওই প্রথম আধুনিকতা। আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্ব, তাঁর মতে, উনিশ শতকের শেষ ভাগে দেখা দিয়েছিল। তিনি এ পর্বের নাম দেন 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'। এর প্রকাশ মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর তৎপরতায়। প্রচলিত প্রভাবশালী ইতিহাসে, যেমন রেনেসাঁসকেন্দ্রিক তাবত পর্যালোচনায়, এই দুই পর্বকে পরস্পর-যুক্ত ধারাবাহিক দুই স্তর হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রথম আধুনিকতার লিবারেল পর্বকে দেখেছেন 'স্বতন্ত্র

একটা ঐতিহাসিক পর্ব হিসেবে', 'যা পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সরলরেখায় যুক্ত নয়' (২০১৩ : ৪১)।

বঙ্কিমের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে 'রক্ষণশীলতা' না বলে আধুনিকতার পর্বান্তর হিসাবে দেখাই যে বাঞ্ছনীয়, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে তার পক্ষে দুটি উদাহরণ দেয়া যাক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষদিকে লেখক ব্রাহ্মণদের অধঃপতনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, পতিত দশায় ব্রাহ্মণরা আর সব সম্প্রদায়কে বিধানজালে বদ্ধ করেছে, এবং তার পরিণতিতে নিজেরাই জালে আটকা পড়েছে। নতুন সংস্করণে এখানে তিনি একটি টীকা যোগ করে লিখেছেন, 'টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক।' আমরা জানি, *ধর্ম্মতত্ত্ব* হিন্দুত্বের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। কিন্তু কেবল এ অর্থেই নতুন সংস্করণের টীকাকে রক্ষণশীল হিসাবে দেখাটা বিভ্রান্তিকর, কারণ *ধর্ম্মতত্ত্ব* কোনো অর্থেই সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনমূলক গ্রন্থ নয়, বরং নতুন হিন্দুধর্মের প্রস্তাব, যাকে 'আধুনিকায়ন' নামেই কেবল ব্যাখ্যা করা সম্ভব (টীকা ৯ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় উদাহরণটি প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশ থেকে নেয়া। নতুন সংস্করণে যুক্ত প্রবন্ধের শেষ টীকায় বঙ্কিম জানাচ্ছেন, 'এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।' 'বড় বেশী ভুল' কথাটা কী? বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।' ভুল বিচারটা কী? নতুন সংস্করণের ভূমিকামন্তব্যে বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না।' আমরা এ প্রসঙ্গেই আগে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের কথা বলেছিলাম (৪.১.২ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানতত্ত্ব কিভাবে দৃষ্টিভঙ্গি ও তজ্জাত সিদ্ধান্ত নির্মাণ করে বর্তমান প্রসঙ্গটি তার একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত। ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড মোতাবেক বঙ্কিম প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলন্ডে যায়, – সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলন্ডের মুনফা।' এই দৃষ্টিভঙ্গি যে উনিশ শতকের কলকাতার লিবারেল দুনিয়ায় চালু ছিল তার প্রমাণ ইংল্যান্ডে সম্পদপাচার বিষয়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার অবস্থান : 'The Hindu Patriot looked upon this annual payment as India's tribute to England for the blessings of civilized rule.' (Chandra 1975 : 116) 'সুশাসনে'র ঔপনিবেশিক এবং প্রাচ্যবাদী মনোভঙ্গির বদলে বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতীয়তাবাদী' অবস্থানে গিয়ে সম্পদপাচারের ডিসকোর্সে উপনীত হয়েছেন – এ পরিবর্তনকে 'রক্ষণশীল' মনোভাব আখ্যা দেয়া নিশ্চয়ই বিবেচনাপ্রসূত হবে না।

৪.২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেকালে কৃষকের পক্ষে তাঁর সন্দর্ভটি রচনা করেছিলেন প্রমথের রায়ত-বন্দনার কাল থেকে তা বহুদিক থেকে আলাদা। প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যের দিক

থেকেই প্রমথ নিজের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। রাজনীতিতে মুসলমান রায়তের ক্রমবর্ধমান দাবি ও প্রভাবের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রবন্ধের শেষাংশে লিখেছেন: 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালি সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কোঅপারেশন-এর প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সারকথা।' [চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব] এ ধরনের কোনো প্রসঙ্গ বঙ্কিমের কালে সামনে আসেনি। দুই প্রবন্ধের রচনাকালে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বেজায় বদল ঘটেছে। সবচেয়ে বড় বদল হল প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের জায়গা থেকে, অন্তত রায়ত-প্রশ্নে, ইংরেজপক্ষের অব্যাহতি। প্রমথ এমন ভঙ্গিতে প্রবন্ধটি লিখেছেন যেন ঔপনিবেশিক শাসকপক্ষ কোনো পক্ষই নয়। বস্তুত, সাতচল্লিশের পরের ভারত সম্পর্কেও কেউ একজন এমন ভঙ্গিতে লিখতে পারতেন। এই না-থাকাটাই যে আরো গভীরভাবে থাকা, সে সত্যই 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের প্রধান ঔপনিবেশিক বাস্তবতা।

বঙ্কিমচন্দ্র কাজ করেছেন এমন এক কালে যখন উপনিবেশিত লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি এবং নব-অনুভূত জাতীয়তাবাদী চেতনার সংঘাত মাঝে-মধ্যেই বেশ প্রকট হয়ে উঠছিল। বঙ্কিমের লেখালেখিতে সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখি। এই বস্তু রবীন্দ্রনাথের কালেও ছিল, কিন্তু তাতে বিরোধের চেয়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি হলেও প্রমথ চৌধুরী লেখালেখি শুরু করেছিলেন অন্তত দুই দশক পরে। তাঁর কালে, বিশেষত 'রায়তের কথা' প্রবন্ধ লেখার কালে, ঔপনিবেশিক শাসন মধ্যবিত্ত মানসে এতটাই 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠেছিল যে, তা আলাদা করে উল্লেখ করার মতো ব্যাপারই আর ছিল না। বিরোধটা ছিল নতুন রূপে – জাতীয়তাবাদী-রাজনৈতিক এলাকায়, সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক এলাকায় নয়। তার এক প্রমাণ এই যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবলতা কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিক অঙ্গনে কোনো যথার্থ প্রতিনিধিরই জন্ম দেয়নি। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলা যায়, সংকট তৈরি এবং সমাধান প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী শাসকপক্ষকে রেয়াত দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন এই স্বদেশি সংকট মোচনের জন্য স্বদেশি পক্ষগুলোই যথেষ্ট। গভীরতর সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের কালেই কেবল এরকম হওয়া সম্ভব। এ প্রবন্ধে এ সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের প্রধান প্রকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বে।

প্রবন্ধের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বের নগ্ন প্রকাশ দেখি। লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা অঞ্চলের 'ঘোর অরাজকতা'র পরিচয় দিয়েছেন ভারতচন্দ্রের কাব্য অবলম্বনে। এজন্য তিনি আর কোনো ইতিহাসের দোহাই খোঁজার দরকার বোধ করেননি। এই অরাজকতার ইতিহাস বরাবরই ইংরেজশাসনের বৈধতার পক্ষে উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়ে আসছিল। অথচ সাম্প্রতিক বহু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাসকে পতনের যুগ না বলে অনায়াসেই আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর উত্থান ও সমৃদ্ধির যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, যার

মধ্যে নবাবি আমলের বাংলাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Bose and Jalal 2002 : 48-55)। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু এ ইতিহাসে সেরকম নিশানামাত্রও পাননি, বরং দেখেছেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠার পর দিল্লির বাদশা 'কোম্পানি বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন'। কিন্তু 'এই কর আদায়ের ভার কোম্পানি নিজ হাতে নিলেন না – নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন'। তারপর ১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু।

১৭৬৫ সালে বাংলায় কোম্পানি-শাসনের সূচনা ঘটে বলে ব্যাপকভাবে মনে করা হয় (সব্যসাচী ১৩৯৬ : ৩৯; Guha 1988: 4)। প্রমথ চৌধুরী সালটিকে প্রায় দুই দশক পেছনে ঠেলে দিয়ে কোম্পানিকে কেবল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকেই রেহাই দিলেন না, এমন ভঙ্গিতে বিবরণীটি তৈরি করলেন যেন অনিচ্ছুক কোম্পানি মূর্তিমান 'সুশাসন' হয়ে নিরীহভাবে অপেক্ষা করছিল শাসনের আহবানের জন্য; আর মন্বন্তরের পর নিরুপায় হয়ে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হল। ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বের এরচেয়ে ভালো নজির আর হতে পারে না। এরপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে রায়তকে স্বত্বচ্যুত করে বড় ভুল তারা করেছিল বটে, কিন্তু সে কেবল ওই জরুরি মুহূর্তে অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে অনন্যোপায় হয়ে। প্রজার স্বার্থের দিকে কোম্পানির কর্তাদের পূর্ণ মনোযোগ ছিল। প্রমথের মতে, ব্যবস্থাটা আপতিক ছিল, কিন্তু 'দেশের জলবায়ুর গুণে' চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে।

বস্তুত স্থানিক-কালিক বাস্তবতার ভিন্নতা এবং এমনকি পদ্ধতিগত ব্যাপক অমিল থাকার পরও বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী দুটি সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সহমত ছিলেন: ইংরেজপূর্ব শাসনামলের অরাজকতা এবং ইংরেজদের প্রজাদরদি অবস্থান সত্ত্বেও 'ভুল' পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির সম্পর্ক নির্ধারণ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে সবসময়ের জন্যই একটা বড় সংকট। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্র এসব ক্ষেত্রে উপনিবেশ আমলের নজির দিয়েই সাধারণত পরিচালিত হয়। যদি বাস্তব কর্মসূচির বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা ও জনমত গঠনের দিক থেকে বিচার করি তাহলেও ওই জনবিরোধী ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার নিবিড় পাঠ বর্তমান কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য জরুরি। 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'রায়তের কথা' এদিক থেকে খুবই প্রাসঙ্গিক টেক্সট।

রচনা দুটি একদিকে ঘোরতর বাস্তব নিয়ে কাজ করেছে, অন্যদিকে যুক্তিশৃঙ্খলার অংশ হিসাবেই সংশ্লিষ্ট তত্ত্বীয় ভিত্তি তৈরি করে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। তাতে স্থানিক-

কালিক বাস্তবতা যেমন গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক তেমনি চিন্তাপদ্ধতির বিশেষত্বের কারণেই রচনাগুলোর কালোত্তর মূল্যও তৈরি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক বাস্তবতাই দুটি প্রবন্ধের প্রধান নিয়ন্ত্রক, এমনকি তত্ত্ব ও ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রশ্ন হল, যদি বাস্তবের অভিঘাতই প্রকাশের সবগুলো মাত্রা এতটা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, তাহলে সৃজনকর্মে ব্যক্তির সক্রিয় কর্তাসত্তার (active agency) পরিসর কোথায়? অন্য যে কোনো সৃষ্টিশীল তৎপরতার মতো আলোচ্য প্রবন্ধ দুটিতেও ওই মাত্রা শনাক্ত করা সম্ভব। আমরা দেখেছি, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির তৎপরতায় উপনিবেশ-নির্দেশিত ভাব-স্বভাবের প্রচণ্ডতা থাকে। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তিকে আলাদা করে চেনা যায়, রচনার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে শনাক্ত করা যায়।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বলা যায়, উনিশ শতকের চর্চার ধারাবাহিকতার মধ্যে রচিত হলেও প্রবন্ধটি সৃষ্টিশীল বঙ্কিমের সমস্ত গুণ ধারণ করছে। অবস্থার ছবি অঙ্কনে, পশ্চাৎপট উন্মোচনে এবং বাস্তব পরিস্থিতি নির্ধারণে প্রবন্ধটি অনন্য। সেসঙ্গে প্রবন্ধটি ধারণ করে আছে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক উদারপন্থা এবং ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের সামঞ্জস্যহীনতাজনিত দ্বিধা, যে দ্বিধার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে খোদ বঙ্কিমেরই ব্যক্তিত্ব ও রচনায়। অন্যদিকে, 'রায়তের কথা' একজন নিরাসক্ত প্রমথ চৌধুরীকে হাজির করে যিনি উপনিবেশের পরিণত সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতিনিধি হিসাবে নিজে লিবারেল থেকেছেন এবং অন্যকে লিবারেল সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যৌক্তিকভাবে প্ররোচিত করেছেন। কর্মসূচিভিত্তিক আলোচনা করে এবং যার জন্য কর্মসূচি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরম মূল্য দিয়ে প্রমথ তাঁর রচনাটিকে বিরলশ্রেণির করে তুলতে পেরেছেন। এ প্রবন্ধে বাংলার ইতিহাসের আরেকটি দিক চিরকালের মতো মুদ্রিত রইল। রায়ত-জমিদার সম্পর্ক যে বাংলাভাগের রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বঙ্কিমের কালে না হলেও ১৯২০-এর দিকে এ বাস্তবতা যথেষ্ট স্পষ্ট মূর্তি পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার ভদ্রলোকশ্রেণির মধ্যে বিষয়টা উপলব্ধি করে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিলেন অল্প কেউ কেউ। প্রমথ চৌধুরী সেই বিরলদের একজন যিনি ভবিষ্যৎটা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। ইতিহাসের পাটাতনে ব্যক্তির স্বতন্ত্র কর্তাসত্তা এভাবেই ঘোষিত হয়।

টীকা

১. প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কেও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রায় সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় (২০১৬ : ১৪৯) : 'তিনিও [প্রমথ] মানবতাবাদী বলে চাষীর দুঃখ নিরাকরণেই আমাদের মুক্তি নিহিত বলে বিশ্বাস করতেন।'

২. আরেকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: '... সেই জমিদার-প্রভাবিত যুগেও 'সাম্যে'র লেখক দরিদ্র-বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের জন্য অজস্র অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন।' (রেজাউল ১৩৬১ : ৫৭)

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসকার অধীর দে দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত (১৩৬৬ : ১৯১) : ''বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি তথ্যবহুল হইলেও ইহার প্রতি পরিচ্ছেদেই দেশের নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগপূর্ণ প্রাণাবেগ ও প্রীতিবিগলিত হৃদয়ের সহানুভূতি উদাত্ত-বলিষ্ঠভাবে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে।' অন্যদিকে 'রায়তের কথা' প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এরূপ : 'এই প্রবন্ধে কৃষক-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের তথ্যবহুল বিস্তৃত বিবরণের মধ্য দিয়া তাঁহার সুগভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষকদিগের দুরবস্থার মূল কারণসমূহের বিচার-বিশ্লেষণে প্রমথ চৌধুরী বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন এবং ফলে, তাঁহার আলোচনাটি নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।' (১৩৬৬ : ৪১২)

৩. বিপরীত উদাহরণও অবশ্য পাওয়া যায়। যেমন, বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন (২০১৩ : ১৫), '... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের নিদারুণ বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করলেও ইংরেজসৃষ্ট সামন্তস্বার্থের ধারক, বাহক ও সেবক হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে' বক্তব্য হাজির করেছেন।... 'ইংরেজের মঙ্গল এবং সমাজের মঙ্গলকে একই সূত্রে গেঁথে 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের পরিবর্তে জমিদারদেরকে লঘুভাবে শাসন করার জন্যে বৃটিশ ভারতীয় সরকারকে পরামর্শ' দিয়েছেন।

৪. আমরা পরে দেখব, প্রমথ চৌধুরী এই ইতিহাস প্রণয়নে অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৫. এ দৃষ্টিভঙ্গি এত সর্বব্যাপ্ত যে কোনো নির্দিষ্ট উদাহরণের প্রয়োজন হয় না। গত শতকের সত্তরের দশক থেকে ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে যথার্থ মূল্য দিয়ে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস পড়ার ধারা বিকশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত – এবং এমনকি পরেও – অধিকাংশ বিবেচনা ও মূল্যায়ন এ ধারায় পড়ে। নতুন ধারার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য : (মোহাম্মদ আজম ২০১৪ : ২৪-২৫; ৩৪-৩৫)।

৬. কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি আছে অথচ তাদের ভূমিস্বত্ব দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ নেই এমন লোকদের প্রতি প্রমথ চৌধুরী বেশ কয়েকবার বিদ্রূপবাণ হেনেছেন। এগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ভাবতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

৭. ১৮৮৫-র আইনে প্রজাস্বার্থ রক্ষিত হয়েছে বলে ব্যাপক প্রচার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের নতুন মুদ্রণ প্রকাশের সময় (১৮৯২) ভূমিকা-মন্তব্যে লিখেছিলেন :

> 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল।

১৮৮৩ সালের খসড়ায় আসলেই বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ছিল – কৃষকের খাজনা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু জমিদারদের সংগঠন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে এই ধারা শিথিল করা হয়। তাতে গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের খানিকটা ক্ষমতায়ন হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত চাষিদের বেশির ভাগই

এই আইনের আওতার বাইরে থেকে গেছে (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৬৬)। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫-র আইনে কৃষকস্বার্থ যতটুকু রক্ষিত হয়েছে, তাতে নগরবাসীদের লাভালাভের হিসাবটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল:

> The Indian Association campaign on the rent bill revealed an interesting concern for making occupancy rights saleable, not necessarily residential and free of all restrictions on sub-letting—all of which would obviously be of great help of 'ryots' settled in Calcutta or other urban centers and enjoying occupancy rights over agricultural lands. (Sarkar 2000 : 78)

৮. ভবতোষ দত্ত (২০০৮ : ৯১) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে মোগল শাসনকে দোষারোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁরই মত মনে করলে ভুল হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের... প্রবন্ধেও এই তথ্যটিই দেখানো হয়েছে।' এই সাফাই-সাক্ষ্য আসলে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, আমরা আগেই দেখিয়েছি, উনিশ শতকের ওই বাস্তবতায় এ ধরনের 'জ্ঞান' উৎপাদন খুবই সাধারণ ঘটনা – ব্যক্তিবিশেষকে তার জন্য দায়ী করা বা কৃতিত্ব দেয়া ঠিক হবে না।

৯. উপনিবেশিত কলকাতা নগরীর অন্তত দেড়শ বছরের আধুনিকতার ইতিহাসে হিন্দুত্বের প্রবল প্রতাপ বা প্রায় ভিত্তিভূমি হিসাবে কার্যকর থাকা মোটেই 'অনাধুনিক' ঘটনা নয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে, হিন্দুত্বের সাথে সম্পর্করহিত হয়ে বা এর বাইরে অন্য কোথাও কলকাতার অন্য কোনো আধুনিকতা ছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০০ : ১৬৪) ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> বস্তুত, জাতীয়তার অর্থ হিন্দু জাতীয়তা, এই ধারণাটিকে কোনও প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় মতাদর্শের ভগ্নাবশেষ বলে ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ধারণাটি সম্পূর্ণ আধুনিক। আধুনিক অর্থেই তা যুক্তিবাদী; অযৌক্তিক আচার-ব্যবহার কুসংস্কার বিরোধী। আধুনিক অর্থেই তা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক; রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কট্টরপন্থী এবং সমাজনীতি নির্ণয় ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। এই মতবাদের মূল আবেদন ধর্মীয় নয়, রাষ্ট্রীয়। সেই অর্থে এর যুক্তির কাঠামো সম্পূর্ণ সেকুলার।

উল্লেখপঞ্জি

অধীর দে (১৩৬৬)। *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা*, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা

অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৭৫)। *বঙ্কিম-মানস*, ৩য় সংস্করণ, গ্রন্থবিতান, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮২)। *বাঙালি লেখকের রায়ত চিন্তা*, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবেশ রায় (১৯৯০) *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ (সম্পা. ১৯৯৭)। *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক*, ২য় প্রকাশ, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০০)। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৩)। *জনপ্রতিনিধি*, অনুষ্টুপ, কলকাতা

বদরুদ্দীন উমর (২০১৩)। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ভবতোষ দত্ত (২০০৮)। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মোহাম্মদ আজম (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা

রবীন্দ্র গুপ্ত (১৯৮৯)। 'উনিশ শতকের রায়ত-চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র', ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত *বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন* গ্রন্থভুক্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

রেজাউল করীম (১৩৬১)। *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলকাতা

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৩৯৬)। *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (১৮৫০-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা

সিরাজুল ইসলাম (২০০২)। *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ৩য় মুদ্রণ, চয়নিকা, ঢাকা

Bose, Sugata and Jalal, Ayesha (2002). *Modern South Asia: History, Culture, Political Economy*, 4th impression, Oxford University Press, New Delhi

Chandra, Sudhir (1975). *Dependence and Disillusionment: Emergence of national consciousness in later 19th century India*, Manas publications, New Delhi

Chatterjee, Partha (1993). *National thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, 2nd impression, University of Minnesota Press, Minneapolis

Foucault, Michel (1984). 'What is Enlightenment?', in Rabinow (P.), ed., *The Foucault Reader*, Pantheon Books, New York

Guha, Ranajit (1988). *An Indian Historiography of India: A nineteenth-Century Agenda and its Implication*, K P Bagchi & Company, Calcutta, New Delhi

Guha, Ranajit (2009). 'Neel-darpan: The image of a peasant revolt in a liberal mirror', in *Small Voice of History : Collected Essays*, Permanent Black, New Delhi

Guha, Ranajit (2016). *A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement*, Orient BlackSwan and Permanent Black, India

Habib, Irfan (1999). *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707*, 2nd revised edition, Oxford University Press, New Delhi

Kaviraj, Sudipta (1998). *The Unhappy Consciousness: Bankimchandra Chattopadhyay and the formation of Nationalist Discourse in India*, Oxford University Press, New Delhi

Khan, Gholam Hossein (1926). *Seir Mutaqherin* (English translation), vol. iii, R. Cambray & Co, Calcutta, Madras

Nandy, Ashis (1989). *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under colonialism*, 2nd impression, Oxford University Press, Delhi

Sarkar, Sumit (2000). *A Critique of Colonial India*, 2nd edition, Papyrus, Calcutta

Spear, Percival (19510. *The Twilight of the Mughals*, Cambridge, England